SUṢAMĀ : Multidisciplinary Research Journal ISSN: 3107-4529
(International Peer-Reviewed & Refereed Journal)
Vol. 1, Issue-4, (Oct-Dec) 2025

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবতা: ঐতিহ্য এবং স্বাতন্ত্র্য

Anupama Karan
Ph.D. Scholar, Dept. of Bengali
University of Kalyani, Kalyani, West Bengal, India
Email: meetwithanupama@gmail.com

Abstract: Mahaprabhu Sri Chaitanyadeva embodied the spirit of Bhakti and transformed Bengal's religious and cultural landscape in the fifteenth–sixteenth century. His Vaishnavism rejected caste-based hierarchy and sectarianism, promoting an inclusive path of devotion. In a society divided by rigid social norms, Chaitanya's liberal approach empowered marginalized communities and made spiritual practice accessible to all. His neo-Vaishnava philosophy differed from earlier traditions and inspired a mass movement. Bengali literature flourished under his influence, with most sixteenth–seventeenth century poets belonging to the Vaishnava tradition. The first Kheturi Mahotsav marked a milestone, introducing Gaurachandrika in Leela-kirtan. Biographical and theological texts of Gaudiya Vaishnavism enriched Bengal's devotional aesthetics. Chaitanya's legacy shaped Bengali identity for centuries, blending spiritual egalitarianism with literary excellence.

Keywords: Sri Chaitanyadeva, Vaishnavism, Leela-kirtan, Kheturi Mahotsav, Nityananda, sixteenth–seventeenth century.

ভগবান বিষ্ণুকে অবলম্বন করে বৈষ্ণবধর্মের আবির্ভাব। ঋগ্বেদের পাঁচ ছয়টি সূক্তে বিষ্ণুর উল্লেখ রয়েছে। সেখানে অন্যতম প্রধান দেবতা তিনি। বেদ বিষ্ণুকে 'উরুক্রম', 'উরুগায়', 'ত্রিবিক্রম' নামে অভিহিত করেছেন। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' বামন রূপ ধারণকারী বিষ্ণুর কাহিনি রয়েছে। সেখানে তিনি বিশেষ কৌশলে অসুরদের হাত থেকে স্বর্গ, মর্ত্য আর পাতালের অধিকার কেড়ে নেন। এই কাহিনি থেকে পুরাণে বামনরূপী বিষ্ণুর বলিরাজকে ছলনা করার জনপ্রিয় কাহিনিটি এসেছে। 'শতপথ ব্রাহ্মণে' আদিত্য ও যজ্ঞকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষণা করা হয়েছে—

"স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ স। স যঃ স যজ্ঞোসৌ স আদিত্যঃ॥"[1]

ছান্দোগ্য উপনিষদে বসুদেব-দেবকী-পুত্র কৃষ্ণের কথা রয়েছে। বৈদিক যুগে বৈষ্ণব ধর্মের দুটি ধারা গড়ে উঠেছিল—বৈখানস এবং পাঞ্চরাত্র। বৈখানস ধারার প্রবর্তক স্বয়ং ব্রহ্মা। আর পাঞ্চরাত্র ধারার প্রবর্তক নারদ। উপনিষদের যুগে রাধাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলেও কৃষ্ণকে বিশেষভাবে গুরুত্বদান করেছেন সেকালের মুনি ঋষিরা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে কৃষ্ণকে মহেশ্বর এবং পরম দেবতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মহাভারতে দুজন বাসুদেবের উল্লেখ আছে। একজন হলেন পৌন্ড্ররাজ বাসুদেব, আর অন্যজন হলেন বাসুদেব কৃষ্ণ। বাসুদেব কৃষ্ণই ঈশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত। দ্রৌপদীর বিবাহসভায় পৌন্ড্ররাজ বাসুদেব এবং বাসুদেব কৃষ্ণ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে—

"যাদব ট্রাইবের বৃষ্ণি কুলের বাসুদেব কৃষ্ণ বিষ্ণু ও নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে ঘোষিত হয়েছিলেন।... বাসুদেব কৃষ্ণ এক ও অবিমিশ্র চরিত্র নয়। মূল ব্যক্তিটি তিনি, যাঁর কীর্তি-কলাপের পরিচয় মহাভারতে পাওয়া যায়। যাদব ট্রাইবের এই অন্যতম প্রধান ব্যক্তিটি যাঁকে মহাভারতের কয়েক স্থানে সংঘমুখ্য বলা হয়েছে, তৎকালীন সর্বভারতীয় রাজনীতিতে একটি বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেছিলেন।"[2]

ঐতিহাসিক তথ্যও দুর্লভ নয়। যাদবদের শাখা অন্ধক, সাত্বত ইত্যাদির নামে একসময়

বৈষ্ণবধর্ম পরিচিত হয়েছে। যেমন পাঞ্জাবের হিসার জেলা থেকে পাওয়া চতুর্থ শতাব্দীর তুশাম লিপিতে একজন 'ভাগবত'-এর উল্লেখ আছে। *Corpus Inscriptionum Indicarum* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে তেমন তথ্য পাই আমরা:

"The inscription does not refer itself to the reign of any king, and is not dated; but, on palaeographical grounds, it may be allotted to the end of the fourth, or the beginning of the fifth century A.D. It is a Vaishnava inscription; and the object of it is to record the making, by an Acharya named Somatrata, of two reservoirs and a house for the use of the God Vishnu under the name of Bhagbat or the Divine One."[3]

বস্তুতপক্ষে কৃষ্ণের উপাসনা শুরু হয়েছিল যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের পূর্বে। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর প্রখ্যাত ব্যাকরণবিদ পাণিনি 'বাসুদেবের ভক্ত' বোঝাতে বিশেষ প্রত্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আলেকজান্ডারের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পুরুরাজের সৈন্যদলের সম্মুখে কৃষ্ণের প্রতিমা ছিল বলে রোমক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন শিলালিপির প্রমাণ থেকেও বোঝা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব কালেই কৃষ্ণ উপাসনা তথা ভাগবতধর্ম যথেষ্ট বিস্তৃতিলাভ করেছিল।

সেন বংশের রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম কিছুটা স্পষ্ট রূপ লাভ করে। 'ভাগবত পুরাণ' তাঁদের সময়কালেই বঙ্গে প্রচলিত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত প্রত্নলেখসমূহের প্রমাণগুলি বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক রমাকান্ত চক্রবর্তী সিদ্ধান্ত টেনেছেন:

"পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম জনপ্রিয় ছিল। রাঢ় অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের ব্যাপ্তি দুর্নির্ণেয়। দক্ষিণ বিহারে গয়া অবতার পূজনের একটি কেন্দ্র রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। সব শ্রেণির লোক বৈষ্ণবধর্মের সমর্থক কিংবা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।"[4]

কৃষ্ণ প্রথমে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে পূজিত হতেন। পরে তাঁকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠাদান করা হয়েছে। আরও পরে কৃষ্ণের স্থান হয় বিষ্ণুরও ঊর্ধ্বে। বিষ্ণু বৈকুণ্ঠবাসী, আর কৃষ্ণ গোলোকবাসী। গোলোকের স্থান বৈকুণ্ঠের ওপরে।

আভিধানিক অর্থে "বৈষ্ণব" বলতে 'বিষ্ণু দেবতা যার' বোঝায়। কৃষ্ণ-বাসুদেবরূপী বিষ্ণুর উপাসকেরাই প্রকৃতপক্ষে একালের বৈষ্ণব।

ভক্তিবাদের জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীমদ্ভগবতগীতায় বিশুদ্ধ ভক্তি সাধনার যে কথা পাওয়া যায় তাতে শ্রদ্ধার সঙ্গে রয়েছে মানব হৃদয়ের একটা গভীর প্রেমের সম্পর্ক। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যের শ্রদ্ধা বা ভক্তি শব্দের যে সমস্ত প্রয়োগ রয়েছে সেখানে শ্রীমদ্ভগবত গীতার ভক্তির অর্থটি ফুটে ওঠেনি। বৈদিক সাহিত্যে বিশিষ্ট ধর্মীয় পারিভাষিক অর্থে ভক্তি শব্দের উল্লেখ নেই। বৈদিক সংগীত পাওয়া যায় তার বিকশিত রূপ ফুটে উঠেছে উপনিষদের যুগে। বৃহদারণ্য উপনিষদ, তৈত্তিরীয় উপনিষদ প্রভৃতিতে ভক্তিভাবের কথা পাওয়া যায়। মন্ডুকোপনিষদে ভগবানের অনুগ্রহ এই যে ভক্তের পরম আশ্রয় সে কথা বলা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩ নং সংমন্ত্রে প্রথম প্রচলিত অর্থে ভক্তি শব্দটির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।"[5]

বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব এর পর উপনিষদের ভক্তিমূলক উপাসনার কথা গুলিকে সংকলিত এবং রূপদান করা আবশ্যক হয়ে পড়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজের দিক থেকে। এর ফলে রচিত হয় ভগবদ্গীতা। যথার্থ বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতগীতাতেই ভক্তিধর্ম সর্বপ্রথম একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল।

ভারতবর্ষের ভক্তি ধর্ম কোন একটি বিশেষ যুগের সৃষ্টি নয়। বিভিন্ন যুগের ভাবনা-চিন্তার ক্রমবিকাশের ফলে ভক্তি ধর্ম একটি পরিপূর্ণরূপ লাভ করে। বিষ্ণুর অবতার

কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যে ভাগবত ধর্ম মহাভারতের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম পর্ব পর্যন্ত উত্তর ভারতে তার পূর্ণ প্রভাব বজায় ছিল। বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন,

"বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে অশোকের যে স্থান বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে গুপ্ত সম্রাটগণকে সেই স্থান দেওয়া যাইতে পারে। পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইলে উত্তর ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অপেক্ষাকৃত হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু ততদিনে দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের তথা ভক্তি ধর্মের নবপর্যায়ে শুরু হইয়া যায়।"[6]

পঞ্চম শতাব্দী থেকে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব ধর্ম তথা ভক্তি ধর্মের যে নতুন পর্যায়ে শুরু হলো সেটা একেবারে আকস্মিক ব্যাপার নয়। অতীত কাল থেকেই দাক্ষিণাত্য ভক্তি-ধর্মের দেশ বলে পরিচিত হয়ে এসেছে। মূল দ্রাবিড় ভাষা এবং বৈদিক ভাষার ঊর্ধ্বতম সীমারেখা একই হলেও ভারতবর্ষে দ্রাবিড় সভ্যতার ইতিহাস আর্য সভ্যতার ইতিহাসের চেয়েও প্রাচীন। বাহ্যিকভাবে দ্রাবিড় এবং আর্যদের মধ্যে আর্যরা অধিক উন্নত ছিল। আর্যদের বিশ্বাস ছিল অগ্নি উপাসনা এবং যাগযজ্ঞের প্রতি। অন্যদিকে দ্রাবিড়দের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর ভক্তিতে। ফলে ভক্তিধর্মকে দ্রাবিড় সভ্যতার সৃষ্টি বলে স্বীকার করেছেন কোন কোন পন্ডিত[7]।

ভারতীয় ভক্তি ধর্ম দ্রাবিড় সংস্কৃতির ফল বলে বিবেচিত হলেও একসময় তা আর্যাবর্তের নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়। প্রাচীন আর্যাবর্তে সেই ভক্তিধর্মের ক্রমবিকাশ ঘটেছে। পঞ্চম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে ভক্তি ধর্মের প্রভাব কমে গিয়ে দক্ষিণ ভারতে তার পুনরুজ্জীবন ঘটে। সমগ্র দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড়দের বিস্তার ঘটলেও দ্রাবিড় সভ্যতা ও সংস্কৃতি তামিলনাড়ুতে যতটা অক্ষুণ্ণ রয়েছে অন্যান্য প্রদেশে ততটা নেই। ভক্তি ধর্ম ধীরে ধীরে উত্তরাভিমুখে ছড়িয়ে পড়তে পড়তে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হয়। মধ্যযুগের ভারতবর্ষে ভক্তি ধর্মের যে প্লাবন বয়ে গিয়েছিল তার মূলে ছিল তামিলনাড়ুর পুনরুজ্জীবিত ভক্তিধর্ম। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকে মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। নীলাচলে সার্বভৌমকে উদ্ধার করার পরে দক্ষিণ ভারত গমনের ইচ্ছা হয়েছিল তাঁ—

"দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল।"[8]

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মহাপ্রভু অবশ্য বলেছিলেন যে বিশ্বরূপকে সন্ধান করাই তার প্রকৃত ইচ্ছা। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যায় যে বিশ্বরূপের পরলোক প্রাপ্তির ব্যাপারে তিনি সবকিছুই জানতেন। আসলে মহাপ্রভুর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারতের যাবতীয় ভক্তিতীর্থ পরিক্রমা করা এবং ভক্ত সঙ্গ লাভ করা। গোদাবরী নদীর তীরে জমিদার-পণ্ডিত রায় রামানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকারের বর্ণনা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়—

"দক্ষিণ গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন॥
সেই সব তীর্থ স্পর্শি, মহাতীর্থ কৈল।
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল॥"[9]

দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম সংগঠন হিসেবে জৈন সম্প্রদায় এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভক্তিপ্রচার কর্মে ব্রতী ছিল। এই সাধনায় জয়লাভ করতে হলে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের সহযোগিতা অতি প্রয়োজনীয় মনে করে শৈব এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের সাধকেরা জাতিভেদ প্রথা বর্জনের আবশ্যকতা অনুভব করলেন। ফলে যে ভক্তি সাধনা কেবল মন্দিরের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হল জনসাধারণের মধ্যে। মন্দিরকেন্দ্রিক যে সাধনা উচ্চ বর্ণের করায়ত্তে ছিল, তার ওপর সর্বসাধারণের অধিকার স্বীকৃত হল। শাস্ত্রের অনুশাসনের সঙ্গে সংযুক্ত হলো অন্তরের আবেগ।

এভাবেই ভক্তি সাধনার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের আত্মরক্ষার বিরাট চেষ্টা স্রোতের মতো প্রবাহিত হল। বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ও এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকল না। তারাও আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। প্রতিটি ধর্ম সম্প্রদায়ই রাজশক্তিকে নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করতে লাগল।

এমনকি অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা অজ্ঞ জনসাধারণকে নিজেদের দলভুক্ত করার প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে।

বৈষ্ণব এবং শৈব সম্প্রদায় একটি নতুন পথ অবলম্বন করলো। তা হলো সংগীত। জনসাধারণের মধ্যে তাদের আবেগময় ভক্তিধর্ম প্রচারের প্রধান বাহন হিসেবে তারা ভক্তিমূলক সংগীত সাধনাকে বিশেষভাবে অবলম্বন করেছিলেন। গ্রামগঞ্জের পথে পথে, দেবতার মন্দির চত্বরে তারা মনের কথাকে গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে থাকলেন। গানের মাধ্যমে কোন সিদ্ধপুরুষ তথা সাধককে সম্মুখে রেখে দলে দলে ভক্ত সাধারণ গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ করলো। প্রবল উন্মাদনার ফলে নতুন নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু হলো। তাদের তীর্থযাত্রায় মন্দির চত্বরে এবং গ্রামের পথে পথে রচিত হওয়া শুরু হলো ভক্তি সংগীত। এই ভক্তি আন্দোলন সমগ্র তামিলনাড়ুতে এতটাই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে একে জন-আন্দোলন হিসাবে গণ্য করা চলে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্মের মাত্রাগত দুটি দিক ছিল। একটি দিক ছিল পঞ্চোপসনার সঙ্গে সংযুক্ত বৈষ্ণবীয় কর্মকাণ্ড। এর সঙ্গে নানা রকমের দার্শনিক মত ও ধর্মশাস্ত্রের সংযোগ ছিল। অন্যদিকটি ছিল প্রায়োগিক বৈষ্ণব গান ও কবিতা।

বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ছিল উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় বাঙালি-সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে রূপান্তরের প্রক্রিয়া ঘটছিল সাড়ম্বরে। মুসলিম রাজাদের আনুকূল্যে একদিকে যেমন মুসলমান সমাজের বিকাশ দ্রুতগতি লাভ করছিল, অন্যদিকে হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্য এই ধর্মাশ্রিত সমাজ কাঠামোকে করে তুলছিল বিপর্যস্ত করে তুলছিল। বাঙালি সমাজে সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং ধর্মীয় কাঠামোকে স্থিতিশীল রাখাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল সেদিন।

এসবের পরও তৎকালীন বাংলার পরিমণ্ডলে বিরাজ করছিল একটি অখণ্ড-উদার মানবতার শূন্যতা। প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধতে শুরু করে। ফলে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থানকে বজায় রাখতে একটি ভাব-বিপ্লবের আবশ্যকতা স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল। এ এক যুগ-প্রয়োজন। এরই পথ ধরে আবির্ভূত হন বাংলাদেশের মধ্যযুগের প্রাণপুরুষ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব—

"বাঙালির হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।"[10]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে স্থানীয় বৈষ্ণবদের নেতা ছিলেন অদ্বৈত আচার্য। শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে আগত ভক্ত বৈষ্ণবরাই সে সময় ভক্তিবাদের সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন। মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রও এসেছিলেন শ্রীহট্ট থেকে। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে,

"সব মিলাইয়া একুনে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পরিকরের সংখ্যা হইয়াছে ৪৯০। এতদ্ব্যতীত জয়ানন্দ ২৭ জন এমন স্ত্রীলোক ভক্তের নাম করিয়াছেন যাঁহাদের কোন পরিচয় পাই নাই। উক্ত ৪৯০ জন ভক্তের মধ্যে অবশ্য শ্রীচৈতন্যের পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ও গুরুবর্গের নামও আছে।"[11]

পরবর্তীকালে পূর্ববঙ্গ থেকে বহু ব্রাহ্মণ কলকাতায় চলে আসেন প্রধানত পৌরোহিত্যের কাজ এবং নব্যধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায়। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বাংলার শাসন ও বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি নবদ্বীপ একইভাবে আকর্ষণ করেছিল শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণদের।

"ষোড়শ শতক পর্যন্ত সপ্তগ্রাম শুধু বৃহত্তম বাণিজ্য কেন্দ্র নয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার রাজধানী, মুসলমান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রকেন্দ্র।.... সেন রাজাদের অন্যতম রাজধানী বোধ হয় ছিল নবদ্বীপ বা মিনহাজ-উদ্-দীন কথিত নুদীয়া নগর। নদীয়া-নবদ্বীপ যে সেন রাজাদের অন্যতম রাজধানী ছিল তাহা কুলজী গ্রন্থমালা দ্বারাও সমর্থিত। সম্বন্ধনির্ণয় ও বল্লাল-চরিত গ্রন্থের মতে বল্লাল সেন বৃদ্ধ বয়সে নবদ্বীপ রাজধানীতেই বাস করিতেন।"[12]

বিশ্বম্ভর মিশ্র তথা গৌরাঙ্গ এক সুবিশাল ব্যক্তিত্ব। নিমাই পণ্ডিত নামে তিনি খ্যাতিলাভে সমর্থ

হন। বিদ্যাবান জ্ঞানবান বিশ্বম্ভর যখন ভক্তিপথের পথিক হলেন, সর্বত্র কৃষ্ণকে দর্শন করলেন, তখন এক হিসাবে বৈষ্ণব সমাজের প্রভূত লাভ হল। তিনি অবশ্য পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের কথা প্রচার করেননি। তিনি এবং তাঁর পরিকরেরা ভাগবতের কৃষ্ণকথার সঙ্গে ভক্তিভাব বিমিশ্রিত করে এক অভিনব দর্শনের জন্ম দিলেন। নিমাই পন্ডিত হয়ে উঠলেন 'পরম বৈষ্ণব'—

"পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাঞি পন্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥"[13]

প্রেমভক্তি ছাড়াও চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এর উদারনৈতিকতা। এই ধর্মে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নেই। মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দুধর্মে যখন প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল, জাত-পাত ধর্ম-বর্ণ বিচারের প্রশ্নে সমাজপতিরা ছিলেন সচেতন, সাধারণ মানুষের ধর্ম-বিচারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোনো অধিকার ছিল না, সে সময়ে শ্রীচৈতন্য এমন উদারনৈতিকতার মধ্য দিয়ে সাম্যবাদের ধারণাকে প্রতিষ্ঠা দান করতে চাইলেন।

বৈষ্ণব ধর্ম এদেশে রাজতন্ত্র এবং সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছিল। বস্তুতপক্ষে, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ভাবধারা প্রাচীন বৈষ্ণব দর্শন থেকে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে। মহাপ্রভুর ডাকে সাড়া দিয়েছিল সমাজের বেশিরভাগ নিঃসহায় ও পিছিয়ে পড়া সাধারণ মানুষ। তিনি বৈষ্ণব ধর্মকে সর্বসাধারণের নাগালে এনে উপস্থিত করেছিলেন। তথাকথিত ধর্মীয় সংগঠনগুলি সমাজের ধনবান ব্যক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে শক্তি ও সামর্থ্য যেমন লাভ করে, চৈতন্যদেব সে রকম সুবিধা পাননি অথবা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হওয়ায় তেমন সুযোগ নিতে চান নি। তথাপি তিনি ছিলেন সে যুগের সমাজপতিদের চক্ষুশূল।

বৈষ্ণবেরা ভক্তিমার্গের পথ অবলম্বন করায় জ্ঞান ও কর্মমার্গের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেননি। অবশ্য জাতপাত ভেদাভেদকে অগ্রাহ্য করার সাহস দেখিয়েছেন। নারীদের বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণে সেকালে কোন বাধা ছিল না। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী সংযোজক হিসাবে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের প্রয়োজনীয়তা গ্রাহ্য করেননি। ফলে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল তৎকালীন বৈষ্ণবেরা। এর অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে ব্রাহ্মণরাই। 'চৈতন্য ভাগবতে'র কবি তেমন ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন—

"এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥"[13]

পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বাংলা দেশের ইতিহাসে সবথেকে বড় ঘটনা হল শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বাঙালি জাতি ভক্তির ডোরে আবদ্ধ হয়ে অখণ্ড রূপে প্রকাশিত হল। নবজাগরণ ঘটল বাঙালির জনজীবনে। এই জাগরণের উৎকৃষ্ট পরিচয় মেলে সাহিত্যের অনুশীলনে, আধ্যাত্মচর্চা এবং কীর্তনগানের মাধ্যমে। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতির বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এর ফলস্বরূপ বৈষ্ণবতা বাংলা সাহিত্যে আড়াইশ তিনশ বছর ধরে জীবিত হয়ে রইল। ষোড়শ শতাব্দীর আধিকাংশ বাঙালি কবিই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা মুখ্য ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ পরিকর অথবা পরিকরের শিষ্য বা অনুশিষ্যত্ব গ্রহণ করে ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর পারিষদবৃন্দ যেমন—অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, সনাতন গোস্বামী, রূপ গোস্বামী প্রমুখের চেষ্টায় এবং তারও পরের মহাত্মাগণ যেমন- শ্রী নিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস, শ্যামানন্দ প্রমুখের ভাব-উন্মাদনায় বাঙ্গালির জীবন ও জীবনচর্যা বৈষ্ণব ভাবাবেগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল। এর ফলে বাংলা সাহিত্য ভক্তিবাদী তথা বৈষ্ণব সাহিত্যের রূপ ধারণ করল। এমনকি যে সমস্ত সাহিত্য বৈষ্ণব ধর্ম কেন্দ্রিক নয়, সেগুলোতেও বৈষ্ণবীয় ভক্তিভাবনা ও কল্পনার ছাপ সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল।

বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেব যে ভক্তি ধর্মের প্রবর্তন করলেন তা অন্য সব দেশের থেকে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করলেও তা একটি শুধুমাত্র আকস্মিক ভূমিকা নয়। ভারতবর্ষের সর্বত্রই নবজাগরণের এই আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কামরূপ, গুজরাট ইত্যাদি প্রান্তীয় অঞ্চলে যে ভক্তি-ধর্মের ভাবাবেগ সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়ে ছিল, তাতে শ্রীচৈতন্যদেবের গৌণ প্রভাব অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, শ্রীচৈতন্যদেবের সরাসরি প্রভাব পড়েছিল বল্লভাচার্যের উপর।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর অনবদ্য দিব্য জীবন যাপনে সার্বজনীন চিরন্তন আদর্শের অনুগত হওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। কয়েকটি মৌল আদর্শের উপর শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তি উদ্দীপনের জন্য নাম-সংকীর্তন। সকল জাতির, সকল বর্ণের মানুষই সমানভাবে আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। হিন্দু ধর্মের সংকীর্ণতা মুছে সার্বিক ঐক্যের দ্বারা অখণ্ড বাঙালি সমাজ উত্থানের ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ও উপদেশ ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল। এমন অভূতপূর্ব প্রেরণার ছাপ পড়েছিল বাঙালি দার্শনিক চিন্তা, ধর্ম, সংগীতকলা, সাহিত্যের সবক্ষেত্রে। এই জাগরণই ছিল গোটা বাঙালি জাতির প্রথম জাগরণ—রেনেসাঁস।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কিছু আগে থেকেই হিন্দু সমাজ ও বাঙালি জাতি তিনশ বছরের অস্থিরতা থেকে মুক্তি পেয়ে সংহত রূপ ধারণ করে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে যেতে শুরু করেছিল। এই নবগঠিত জাতি নিজেদের স্বরূপ চিনতে ও জানতে শিখল শ্রীচৈতন্যের মধ্যে। মোড় ফিরল বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির। নতুন গতিতে শক্তি পাওয়া গীতিকবিতার স্রোত প্রবল থেকে প্রবলতর হল। বাঙালি অপদেবতার পূজা, উপদেবতার উপাসনা বাদ দিয়ে দেবতার লীলা সহচর ও দেবকল্পিত মহাপুরুষ মহাপ্রভুর ভক্তে রূপান্তরিত হল।

ষোড়শ শতকের শেষে সংগীতকলার প্রকৃষ্ট দান রস-কীর্তন পদ্ধতি বাংলার সাহিত্য ও সমাজ গ্রহণ করে। নরোত্তম দত্ত ও তাঁর সহযোগী মার্দঙ্গিক দেবীদাস এই কৃতিত্বের অধিকারী হলেও শ্রীচৈতন্যদেবই এর প্রথম সূত্রপাত করেন।

চৈতন্যদেবের নব্য বৈষ্ণব দর্শন ভক্তির জোয়ারে ভাসিয়ে দেয় সমকালীন বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন। রবীন্দ্রনাথ এই যুগপ্রেক্ষিত প্রসঙ্গে বলেছেন—

"বর্ষাঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক-একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা আসিয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে-সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।"[15]

মহাপ্রভুর ভক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল মানব জীবনকে সমৃদ্ধতর এবং অর্থময় করে তোলা। সন্ন্যাসী হলেও জীবনকে তিনি স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মধ্যে ছিল সামাজিকতা এবং অনন্য সাধারণ রসবোধ। সর্বদা তিনি নিজেকে ঈশ্বর তথা ঈশ্বরের অবতার হিসেবে উপস্থাপিত করতে চাননি। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

"কভু লৌকিক রীতি যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য প্রকটন।।"[16]

চৈতন্যদেবের সঙ্গে আমাদের কামনা বা ভয়ের নয়, সেদিন গভীর ভক্তির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমাদের 'অন্তরের ধন'। দেবশক্তি যখন বাইরে থাকে, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তার আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয়, তখন তাঁর সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় সেই দৈবশক্তি অপ্রসন্ন হলে আমাদের অনিষ্ট করতেই পারে, এই আশঙ্কা তখন আমাদের অভিভূত করে রাখে। কিন্তু

দেবতা যখন অন্তরের আত্মীয় হয়ে ওঠেন, তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়। সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

বৈষ্ণব ধর্মভাবনায় 'ভক্তি' বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই 'ভক্তি' নেহাতই সাধারণ বিষয় নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তের ব্যক্তিগত অথচ অনির্বচনীয় সম্পর্ক অনুভূত হয় এই ভক্তির মাধ্যমে। ঈশ্বরের ধারণার জন্য ভক্তি অনিবার্য শর্ত। এই ভক্তি বৈধী এবং রাগানুগা ভেদে ভিন্ন।

বৈধীভক্তিতে ভক্ত ভগবানকে দেখেন ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাবে। আর রাগানুগা ভক্তিতে তাঁকে মাধুর্য মণ্ডিতভাবে দেখেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে ঈশ্বর সেবার শ্রেষ্ঠ পথ হল রাগমার্গে মাধুর্যমণ্ডিত প্রেম ভিত্তিক সেবা। এই দর্শনে ভগবানের ঐশ্বর্যময় রূপকে পরিহার করে মাধুর্যময় রূপের গৌরব ঘোষিত হয়েছে। হরিবংশ পুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যকে পরিহার করাটা যে স্বয়ং কৃষ্ণের অভিপ্রেত তা বলা হয়েছে। পুরাণ এবং মহাভারতে প্রহ্লাদ, নারদ, উদ্ধব এবং ভীষ্ম যে ভক্তির কথা বলেছেন সে ভক্তি আসলে প্রেমভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতে সগুণ এবং নির্গুণ দু'প্রকার ভক্তির কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতিজাত গুণময়ভক্তি সগুণ, তা মানুষের আয়ত্তাধীন এবং অপ্রাকৃতিক গুণহীন ভক্তি নির্গুণ, তা ঈশ্বর লাভের সহায়ক। মাধবেন্দ্রপুরী গৌড়দেশে সর্বপ্রথম আবেগময় প্রেমভক্তি প্রচার করেছিলেন বলে জানা যায়।

"ভক্তি রসে মাধবেন্দ্র আদি সূত্রধার।"[17]

মহাপ্রভুর আগমনের পূর্বে ভক্তির পরাকাষ্ঠা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী। চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস মাধবেন্দ্রপুরীর ভক্তির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন—

"মাধবেন্দ্র কথা অতি অদ্ভুত কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন।।"[18]

রাগানুগা ভক্তির মার্গে রায় রামানন্দ প্রথম মহাপ্রভুকে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাবে উপাসনার কথা বলেছেন। রামানন্দ রাধাপ্রেমকে সর্বসাধ্যসার জানিয়ে সখীভাবে সাধনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মতে—

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমনি।
যাহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি।।"[19]

যদিও স্বয়ং মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিলেন যে, তিনি ভক্তিতত্ত্ব মোটেও জানেন না। তিনি মায়াবাদের জ্ঞানমগ্নতাতেই ডুবে রয়েছেন—

"প্রভু কহে মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী।
ভক্তি তত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি।।"[20]

বস্তুতপক্ষে সখীভাবের সাধনা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়।

বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিতে সর্বকারণের কারণ শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির আন্তর সত্তাকে প্রতিনিয়ত তাঁর অমোঘ বংশীধ্বনির দ্বারা আকর্ষণ করছেন। বৈষ্ণবের কল্পনায় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং এই বিশ্ব চরাচর তাঁর দেহকান্তি। সৃষ্টি ও স্রষ্টার এই দ্বৈত কল্পনা থেকেই ভক্তির আগমন। এই ভক্তি গাঢ় হলে প্রেমের জন্ম হয়। ভগবান অনাদি অনন্ত। তিনি নির্বিকল্প। তবুও তিনি অনন্ত প্রেমের মধ্যে ধরা দেন। সমগ্র জীবনের সুখ-দুঃখময় বিচিত্র পথ তাঁরই অভিসারের পথ। এই পথেই তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটে। বিশ্ব ও মানব জীবনের সকল বৈচিত্র্যকে ভগবানের প্রেমের লীলা বলে অনুভূত হওয়াটাই বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের সারকথা।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় নবদ্বীপ শান্তিপুর অঞ্চল। যে সমস্ত পণ্ডিত রাজসভার সংস্পর্শে আসতেন, তাঁদের সম্মান ও ধন-সম্পত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত। কিন্তু সাধারণ জনসাধারণ তাঁদের সংস্পর্শ থেকে দূরে দূরে থাকত। সে সময়ে বৃহত্তর বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে বিদ্যার আদান-প্রদান করতে আসতে থাকতেন। তাঁদের কেউ ছিলেন ধনী জমিদার, কেউ ছিলেন জমিদারদের আশ্রিত, আবার কেউ কেউ দরিদ্র পণ্ডিত

ছিলেন। হোসেন শাহের সিংহাসন লাভের পূর্বের কয়েক বছর গৌড়ের সিংহাসন নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলে। সে সময় বঙ্গদেশে রাজনৈতিক অশান্তি যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল। অনেকে মনে করতেন গৌড়ের সিংহাসনে কোনো ব্রাহ্মণ রাজা হবে। হয়তো সে কারণেই নবদ্বীপে মহাপ্রভুর বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে স্থানীয় শাসনকর্তারা আশঙ্কা অনুভব করেছিলেন। মহাপ্রভুর বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা তাঁর অনুগত ব্যক্তি ও অনুচরদের রাজশাস্তির ভয় দেখাত সংকীর্তন বন্ধ করার জন্য। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন—

"শুনিলেক নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ।।"[20]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্ব থেকে বৈষ্ণব আচার্যদের বাড়ির মেয়েরা যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষা পেতেন। নিত্যানন্দের পুত্রবধূ বীরচন্দ্র গোস্বামীর স্ত্রী সুভদ্রা দেবী সংস্কৃতি একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। শাশুড়ি জাহ্নবা দেবীর প্রশস্তিমূলক *'অনঙ্গকদম্বাবলী'* গ্রন্থ। আবার শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা হেমলতা দেবী বেশ কিছু বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈষ্ণবীয় আয়োজন প্রথম খেতুরি মহোৎসব। চৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ ষড়গোস্বামীদের মধ্যে অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য, রামচন্দ্র কবিরাজ, শ্যামানন্দ প্রমুখ পন্ডিত ভক্তবৃন্দের বিশেষ আলোচনা হয়েছিল বৃন্দাবনে। সেখানেই সম্ভবত শ্রীজীব গোস্বামী বৈধ তথ্য এবং সক্রিয় তত্ত্ব প্রচারের উপর জোর দিয়েছিলেন। হয়তো বৃন্দাবনে বসে স্থির হয়েছিল যে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৈষ্ণবদের এক স্থানে নিয়ে আসতে হবে এবং তাদের মধ্যে বৃন্দাবনী তত্ত্ব প্রচারের জন্য মহোৎসব করার প্রয়োজন। অবশ্য এ ধরনের মহোৎসব অনুষ্ঠিত করতে হলে প্রচুর অর্থ দরকার। মহোৎসবের অর্থ যোগানোর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বনকারী রাজা বীর হাম্বির, খেতুরির রাজা সন্তোষ দত্ত, শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ, বৈষ্ণব গুরু রসিকানন্দ, রেমুনার রাজপুত্র এবং নিত্যানন্দের কিছু বৈষ্ণব শিষ্য।

বৃহত্তর বৈষ্ণব মহোৎসব হিসাবে উল্লেখ করা চলে কাটোয়ার মহোৎসব, শ্রীখন্ডের মহোৎসব এবং রাজশাহী জেলার গরানহাট পরগনার খেতুরি গ্রামের খেতুরি মহোৎসবের নাম। মহোৎসবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় উৎসব হয় খেতুরিতে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতে, শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষিত, কবি গোবিন্দদাস কবিরাজের অগ্রজ রামচন্দ্রের ভবনে শ্রীনিবাস, নরোত্তম দাস ঠাকুর এবং কবি গোবিন্দদাসের উপস্থিতিতে খেতুরী মহোৎসবের চিন্তাভূমি প্রস্তুত হয়েছিল:

"খেতুরি মহোৎসবের পরিকল্পনা বুধরিতে বসেই স্থির হল, রামচন্দ্রালয়ে।"[22]

খেতুরির মতো স্থানকে বিনা বিচারে হঠাৎ নির্ধারণ করা হয়নি। মহোৎসবের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রস্তাবক ও আয়োজকদের দুরদৃষ্টতা কার্যকরী ভূমিকা রেখেছিল:

"উত্তরবঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার সম্প্রসারণের জন্যই খেতুরিকে বেছে নেওয়া হয়। সমগ্র উত্তরবঙ্গে শাক্ত বামাচার অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। তার পৃষ্ঠপোষক ছিল দস্যু-বৃত্তিধারী স্থানীয় জমিদারগণ। শাক্ত প্রভাবকে খর্ব করার জন্যও খেতুরিতে মহোৎসব করা হয়।"[23]

১৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় প্রথম খেতুরি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই মহোৎসবে জাহ্নবা দেবীর নেতৃত্বে ২৯ জন বৈষ্ণব, নবদ্বীপের ৩ জন বৈষ্ণব, শান্তিপুরের ৯ জন, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদের মোট ৩৬ জন, মেদিনীপুরের ২ জন এবং অন্যান্য স্থান থেকে আগত ১৬ জন বৈষ্ণব যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে জাহ্নবা দেবী, কবি জ্ঞানদাস, মীনকেতন রামদাস, কবি বলরাম দাস, কবি বৃন্দাবন দাস, কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ, শ্যামানন্দ রসিকানন্দ, কবিকর্ণপূর, শ্রীনিবাস আচার্য প্রমুখ বৈষ্ণব প্রধানেরা উপস্থিত ছিলেন।

খেতুরি মহোৎসবে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থপাঠ বিশেষ ভাবে প্রাধান্য পেয়েছিল। এই উৎসবে মহাপ্রভুর পূজা, কৃষ্ণ

পূজা, কীর্তন বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। এখানেই প্রথম রাধাকৃষ্ণের যুগলমন্ত্রে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি পূজার নির্দেশ মেনে নেওয়া হয়েছিল। গোস্বামীদের রচিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি বৈষ্ণব গ্রাহ্যতা লাভ করেছিল খেতুরি মহোৎসবেই। চৈতন্যদেবের পবিত্র জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা তথা দোল উৎসবের দিন খেতুরি মহোৎসব শুরু হয়েছিল। এই মহোৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এক জাতি এক ধর্মের বার্তা সমগ্র বঙ্গের জনসমাজে পৌঁছে দেওয়া। খেতুরিতে বিরাট আকারের মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাও উৎসবের একটি প্রধান দিক ছিল। মহোৎসবে গৌরাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ, বল্লভীকান্ত, রাধারমণ, রাধাবল্লভ এবং ব্রজমোহনের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং এঁদের পূজনীয় দেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছিল।

খেতুরি মহোৎসবে সর্বসম্মতিক্রমে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল— প্রথমত, বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহকে প্রচার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, নতুন নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তৃতীয়ত, তীর্থদর্শন করতে হবে। এই মহোৎসবেই লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তনের প্রারম্ভে গৌরাঙ্গ বিষয়ক গান তথা গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার রীতি প্রথম চালু হয়। অনুষ্ঠানের পালাকীর্তনে খোল করতাল বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গড়েরহাট পরগনার রীতি বা ঢঙ অনুসৃত হয়েছিল। একেই পরবর্তীকালে 'গরানহাটি কীর্তন' বলা হয়। এর সমসময়েই শ্রীখন্ড এলাকায় মনোহরশাহী ঘরানার কীর্তন, সাতগাছিয়া অঞ্চলে রানিহাটি বা রেনেটি ঘরানার কীর্তন এবং মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়খন্ডী ঘরানার কীর্তন প্রচলিত ছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিভিন্ন ঘরানার এই কীর্তনগুলি বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে যে জীবনী সাহিত্যের রচনা শুরু হয়েছিল, সেই ধারায় বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষায় অনেকগুলি জীবনী কাব্য রচিত হয়েছিল। মুরারীগুপ্তের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃতম্', যা 'মুরারী গুপ্তের কড়চা' নামে বিখ্যাত, সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। পরমানন্দ সেন তথা কবি কর্ণপূরের দুটি মূল্যবান গ্রন্থে মহাপ্রভুর জীবনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থ দুটি অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্' কাব্য এবং 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক। এই শতাব্দীতেই রচিত হয়েছিল বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', লোচন দাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যটিও ষোড়শ শতাব্দীর শেষপর্বের কোন এক সময়ে রচিত হয়েছিল। চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গবিজয়' কাব্যটি জয়ানন্দের কাব্যের পূর্বে রচিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলির প্রসঙ্গে গোবিন্দদাসের কড়চার কথাও উল্লেখ করতে হয়। এই গ্রন্থটিকে প্রাচীন এবং প্রামাণ্য হিসেবে অনেক পন্ডিত গ্রহণ করে থাকেন।

চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও দর্শনের গ্রন্থসমূহ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশের বৈষ্ণবতাকে অলংকৃত করার পাশাপাশি চূড়ান্তভাবে সমৃদ্ধ ও সমুন্নত করেছে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে বাংলায় বৈষ্ণবদের ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে হোলি সংযুক্ত হয়। তৃতীয়-চতুর্দশ শতক থেকে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতের সর্বত্রই বসন্ত উৎসব বা কামোৎসব নামে একটি উৎসবের প্রচলন ছিল। অষ্টম শতকের 'মালতি মাধব' নাটকে, তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীর বাৎসায়নের কামসূত্রে, একাদশ শতকের আলবেরুনীর বিবরণে বসন্ত উৎসবের কথা রয়েছে। ষোড়শ শতকের রঘুনন্দনের গ্রন্থেও এই উৎসবের কথা পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে হোলির বিশেষ প্রচার চোখে পড়ে। ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন—

"ষোড়শ শতকের পর কোনও সময়ে চৈত্রীয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলী বা হোলক উৎসবের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় এবং কামমহোৎসব অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। বস্তুত, ষোড়শ শতকের পর কামমহোৎসবের কোনও উল্লেখ বা প্রচলন কোথাও আর দেখা যায় না।"[24]

ষোড়শ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে গুরুবাদ গভীরভাবে তার শিকড়

বিস্তার করেছিল। চৈতন্যদেবের কোন কোন ভক্ত, অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের বংশধরেরা এবং তাদের কোন কোন প্রধান ভক্ত 'গোস্বামী হয়ে' গুরু বংশের পত্তন করেছিলেন। শ্রীনিবাস, নরোত্তম দাস এবং শ্যামানন্দ তিনটি বৃহৎ গুরু সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রীনিবাস ছিলেন ব্রাহ্মণ, নরোত্তম দাস ছিলেন কায়স্থ এবং শ্যামানন্দ ছিলেন সদগোপ। এই তিন ব্যক্তিত্ব বৃন্দাবন থেকে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। বৈষ্ণব গুরু এবং মহান্তরা যে সাধন ব্যবস্থা অনুমোদন এবং অনুশীলন করতেন, তা পদাবলী কীর্তন, নাম সংকীর্তন, নগর কীর্তন, লোকনৃত্য, লোক সংগীত প্রভৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল বৈষ্ণব সমাজের উৎসব ভাবনা। সুকুমার সেন লিখেছেন:

"অষ্টপ্রহর ও চব্বিশ প্রহর নাম সংকীর্তন এবং ভোজন মহোৎসব—যাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন চৈতন্য পুরীতে এবং নিত্যানন্দ পানিহাটিতে, জনসাধারণের কাছে অভিনব উৎসব সমাজের উদ্দীপনা জাগাইয়া দিল।"[25]

চৈতন্যদেবের ধর্ম ভাবনার প্রভাবে সাধারণ বাঙালির সমাজ এবং ভাবনার জগতে অনেকটা সংস্কার সাধিত হয়েছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে। সাধারণ জনসমাজের মধ্যে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়েছিল। বৈষ্ণব ঘরের মেয়েরাও কেউ কেউ পুরুষের সমান শিক্ষা লাভ করতে শুরু করে। চৈতন্যদেবের ধর্মভাবনা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। অবশ্য সেখানে যারা মিলিত হতেন তাঁরা প্রধানত অগৃহস্থ এবং সাধু। এর বিপরীত দিকে গৃহস্থদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা আগের চেয়েও গাঢ় হতে শুরু করে। ব্রাহ্মণদের স্মৃতি-শাসন দিন দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। রাঢ় বাংলার ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা বিশেষভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যত দিন যেতে থাকে কৌলীন্য প্রথার বিষ সমগ্র বঙ্গের সমাজকে ক্রমে বিষাক্ত করে তোলে। ব্রাহ্মণরা বিদ্যাচর্চার চেয়ে কৌলিন্য রক্ষাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে থাকে। ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা ক্রমে দীনহীন হয়ে যায়।

"ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্গালার সমাজে ও সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণেরাই ছিল শেষ কথা। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ব্রাহ্মণ সে অধিকার হারাইতে লাগিল। গ্রামের নেতৃত্বে পন্ডিত ব্রাহ্মণের স্থান লইতে লাগিল জমিদার-তালুকদার-পত্তনিদার। শেষোক্ত ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা ও সঙ্গতি যে সাধারণত খুব বেশি ছিল এমন নয়।"[26]

নগর-সংকীর্তনের প্রবর্তন করে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সমকালীন সমাজকে সংহত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তা সারা পৃথিবীর সমাজবীক্ষার ইতিহাসে অভিনব। সমাজের নিম্নবর্গের ব্রাত্য মানুষেরা মহাপ্রভুর ভক্তি-আন্দোলনে দলে দলে যোগদান করেছিলেন। ভক্তি-আন্দোলনের এই ক্রমবিকাশ তথাকথিত শিষ্ট সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাঁরা এটুকু বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, বৈষ্ণবধর্ম সমাজে প্রচলিত হলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আরও অবনমন ঘটবে। ফলে শিষ্ট সমাজ চৈতন্য-বিরোধিতার পথ অবলম্বন করেছিল। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মহাপ্রভুকে প্রতিহত করবার শক্তি তাদের ছিল না।

কেবলমাত্র নিজের মুক্তি কামনায় ঈশ্বর আরাধনাতে জীবন নিয়োজিত না করে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি কামনায় চৈতন্যদেব ভক্তি-আন্দোলনকে সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত ও প্রচারিত করতে চেয়েছিলেন। হিন্দুরের পাশাপাশি মুসলমানদের তিনি সসম্মানে বুকে স্থান দিয়েছিলেন।

বস্তুতপক্ষে, ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম-আন্দোলনে হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদেরও সমান অংশীদারিত্ব ছিল। বাংলার অনেক বিখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান নিজেদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম এবং সমাজের সংকীর্ণতা ত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। হরিদাস ঠাকুর তার উজ্জ্বল উদাহরণ। আবার ষোড়শ সপ্তদশ শতকে অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণব সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের রচিত পদে মানব-মৈত্রীর বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

"বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষভাবে মুসলমান সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। ন্যূনপক্ষে ১২১ জন

মুসলমান কবির রচিত বৈষ্ণব পদাবলী আমাদের জানা আছে।"[27]

মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ করলেও মহাপ্রভু ছিলেন মনেপ্রাণে আধুনিক, কুসংস্কারবিহীন এক মুক্ত মন ও মননের মানুষ। মানবতার অপমানের বিরুদ্ধে তিনি জীবনভর প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছেন। সামাজিক অচলায়তনকে তিনি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন, বর্ণভেদের বিরুদ্ধে হয়েছিলেন সোচ্চার। অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষজনকে বুকে স্থান দিয়ে মানবাত্মার জয়গান গেয়েছিলেন।। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে কোলাকুলি করার 'রঙ্গ' এই বঙ্গে ইতিপূর্বে ছিল না।

চৈতন্যদেবের নাম-সংকীর্তন এবং ভক্তি-আন্দোলনের পরিণতিতে সমগ্র বাংলা জুড়ে উদার মুক্ত চিন্তা-চেতনার বিস্তারলাভ ঘটেছিল। এরই প্রভাবে মুসলমান কবিরা একেশ্বরবাদী বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। আবার স্মার্ত সমাজপতিদের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে আন্দোলন করার সাহস দেখিয়েছিলেন মধ্যযুগের বাংলার প্রাণপুরুষ মহাপ্রভু:

"চৈতন্যদেবের বলিষ্ঠ চরিত্র, পৌরুষদীপ্ত পদক্ষেপ নড়বড়ে বৈষ্ণব আন্দোলনকে করেছিল শক্তিশালী। তাঁর সাংগঠনিক শক্তির জোরে বৈষ্ণব আন্দোলনে জোয়ার এসেছিল। তিনি মানুষকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেন। জাতপাত সেখানে কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।"[28]

নারী জাতির উন্নয়নও এই পর্বে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কুলবধূরা প্রকাশ্যে সংকীর্তনে যোগদান করা শুরু করেন। নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবা দেবী খেতুরি মহোৎসবের সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতা দেবীও পুরুষের বেশ ধারণ করে সাধনার পদ্ধতি প্রচলন করেছিলেন। ষোড়শ সপ্তদশ শতকের নারী জাগরণের এই বৈপ্লবিক দিকটির কথা সবিশেষ আলোচনার যোগ্য।

অবশ্য কালের গতি কুটিল। তাই সমাজ-সংস্কারের উজ্জ্বল আলো অধিক কাল স্থায়িত্ব লাভ করল না। যে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক প্রেম এবং ভক্তিবাদের ওপর বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন মহাপ্রভু, কালক্রমে তা ভিন্ন পথ আর শপথের কর্দমাক্ত স্রোতে মলিন হয়ে গেল:

"এই সমুদয়ের মধ্য দিয়া যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটি মহৎ সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল এক শতাব্দীর বেশী তাহা স্থায়ী হয় নাই। বরং নূতন ভাবে নানাবিধ কলুষতার আবির্ভাব হইল।"[29]

ষড়গোস্বামীর উত্তরাধিকার লাভ করেন শ্রীনিবাস-শ্যামানন্দ-নরোত্তম দাস প্রমুখেরা। এঁদের প্রচারিত বৈষ্ণবতায় বাংলাদেশে নতুনভাবে জোয়ার আসে। হরিনাম সংকীর্তন এবং মহোৎসবে বাংলাদেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার বলে কল্পিত শ্রীনিবাস আচার্য পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব এবং অধ্যাত্ম ভাবনায় এঁদের মধ্যে মুখ্য স্থান লাভে সমর্থ হন। তিনি বৃন্দাবনের গোস্বামীদের কাছের শিষ্যত্ব লাভ করেন এবং বৈষ্ণবতার শিক্ষায় সমৃদ্ধ হন। সম্ভবত শ্রীনিবাসই বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দেন। তাঁর তত্ত্বধানেই বহু অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ বৃন্দাবন থেকে বাংলায় নিয়ে আসার পথে বিষ্ণুপুরের নিকটে দস্যুদের হাতে পড়ে। সেই সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থাদির মধ্যে ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'-এর পাণ্ডুলিপি। সেই পাণ্ডুলিপি ডাকাতির খবর পাওয়ার পর বৃন্দাবনে কবিরাজ গোস্বামী যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে জানা যায়!

পরবর্তী সময়ে বিষ্ণুপুর বাংলার অন্যতম প্রধান বৈষ্ণব-কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠা পায়। কালক্রমে শ্রীনিবাস এবং তাঁর কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য-প্রশিষ্যরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে নরোত্তম দাস হয়ে ওঠেন উত্তরবঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের প্রধান উৎস। শ্যামানন্দের প্রভাবে মেদিনীপুর ও ওড়িশার সীমান্ত প্রদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসারতা লাভ করে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যে গীতিমুখরতার যুগ। এই সময়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ মূলক বীরগাথা বা জাতীয় বীরের কাহিনি রচিত হয়নি। বৈষ্ণব আন্দোলনের তীব্রতা বাংলা সাহিত্যকে কোমলতা দান করেছে। "বৈষ্ণব আন্দোলন বাঙালীর সাহিত্যে পৌরুষ ও পুরুষকারকে আরও খর্ব করেছে।"[30]

স্পষ্টতই অনুভব করা যায় যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বঙ্গদেশে বৈষ্ণবতা ঐতিহ্যকে

অস্বীকার না করেও স্বাতন্ত্র্যের পথে অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছে। সম্ভবত সেই গতিশীলতার বুকে অবক্ষয়ের রক্তচিহ্নও প্রচ্ছন্ন আকারে ছিল।আনন্দোৎসবের মাঝে সেই বেদনার অশ্রুটুকুর হিসাব ভুলে থাকা চলে; কিন্তু অস্বীকার করা চলে না!!

Endnotes

1. ভট্টাচার্য, বিধুশেখর অনূদিত, শতপথ ব্রাহ্মণ, প্রথম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩১৬, পৃষ্ঠা ১০১
2. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০০, পৃষ্ঠা ১৭৭
3. Faithfull, Fleet John, *Corpus Inscriptionum Indicarum*, vol III, The Superintendent of Government Printing, India, Calcutta, 1888, P. 270
4. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম একটি ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১০
5. দেবী, পুষ্প সম্পাদিত, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, উপনিষদ অর্ঘ্য, মহেশ লাইব্রেরী, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ৪৩
6. ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ, *ভারতীয় ভক্তি সাহিত্য*, লেখাপড়া, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ২৫
7. Karmakar, A.P. *The Religion of India*, volume I, Mira Publishing House, Lonavla, India, First Published, 1950, P. 316
8. গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, মধ্য লীলা, সপ্তম পরিচ্ছেদ, সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, জেনারেল লাইব্রেরি, কোলকাতা, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ১৮৬
9. গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, মধ্য লীলা, নবম পরিচ্ছেদ, সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, জেনারেল লাইব্রেরি, কোলকাতা, ১৩৬৮, পৃষ্ঠা ২০৯
10. দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ, আমরা, *কুহু ও কেকা*, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯২৯, পৃষ্ঠা ১৬০
11. মজুমদার, ড. বিমানবিহারী, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃষ্ঠা ৫৬৭
12. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ২৯৯
13. দাস, বৃন্দাবন, *চৈতন্য ভাগবত*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৭৭
14. দাস, বৃন্দাবন, *চৈতন্য ভাগবত*, সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য অকাদেমি, কোলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৩৮৪
15. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য সৃষ্টি, *সাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কোলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬১, পৃষ্ঠা ৯৬
16. গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, অন্ত্যলীলা, সম্পাদক রাধাগোবিন্দ নাথ, ভক্তিগ্রন্থ প্রচার ভাণ্ডার, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৫৯, পৃষ্ঠা ৩৬৭
17. দাস, বৃন্দাবন, *চৈতন্য ভাগবত*, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, ১৯২৮, পৃষ্ঠা ১৮৯
18. দাস, বৃন্দাবন, *চৈতন্য ভাগবত*, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ১৯২৬, পৃষ্ঠা ৫৫
19. গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত*, মধ্যলীলা, প্রথম খণ্ড, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, কলিকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৪৮৫
20. গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, *চৈতন্য চরিতামৃত*, মধ্যলীলা, প্রথম খণ্ড, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, কলিকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৪৯২

21. দাস, বৃন্দাবন, *চৈতন্য ভাগবত*, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, চতুর্থ সংস্করণ, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ১৯২৬, পৃষ্ঠা ১৩৭
22. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার, *গৌরাঙ্গ পরিজন*, মিত্র ও ঘোষ কলিকাতা প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫, পৃষ্ঠা ৪৩৫
23. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৮৮
24. রায়, নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, পৃষ্ঠা ৪৮৭
25. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪
26. সেন, সুকুমার, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৪
27. সুর, অতুল, *বাংলার সামাজিক ইতিহাস*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৬৮
28. মণ্ডল, মৃত্যুঞ্জয়, *চৈতন্যদেব*, পত্রভারতী, কলকাতা, পৃষ্ঠা ১৯
29. মজুমদার, রমেশচন্দ্র, *ধর্ম ও সমাজ*, *বাংলা দেশের ইতিহাস*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৭, পৃষ্ঠা ২৭৮
30. হালদার, গোপাল, *গোপাল হালদার রচনাসমগ্র ২*, ধর, অমিয় সম্পাদিত, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৬৩, পৃষ্ঠা ৮০

———